গুড নাইট

নিমাই ভট্টাচার্য



গুড নাইট

নিমাই ভট্টাচার্য

কল্লোল প্রকাশনী ॥ ঢাকা

প্রকাশিকা :
নূর জাহান বেগম
রামগঞ্জ, নোয়াখালী

১ম প্রকাশ—১৯৭৮ ইং

মুদ্রণে : কাকলী মুদ্রায়ণ, ঢাকা—৫

মূল্য :—দশ টাকা মাত্র।

করি।' রীণা আরেকবার হাতের ঘড়িটা দেখেই বললো, যাই এবার টেলিফোন করি।

'ফুল ডে না হাফ্ ডে?'

'মিস সোন্ধীর প্রশ্ন শুনে রীণা একটু দাঁড়াল। বললো, ফুল ডে।

'তাহলে তো লাঞ্চের সময় দেখা হবে।'

'যদি এখানে লাঞ্চ খায় তাহলে তো।'

মিস সোন্ধী একটু হাসল। রীণা একটু এগিয়ে গিয়েই টেলিফোনে ডায়াল ঘুরাল থ্রী-জিরো-সেভেন, গুড মর্নিং স্যার! দিস ইজ মিস চাউডারী ফ্রম·····

টেলিফোনের ওপাশ থেকে হৃদ্যতা পূর্ণ গলায় জবাব এলো, রিপাবলিক্যান ট্রাভেল সার্ভিস।

'দ্যাটস রাইট স্যার।'

'ইজ ইট নাইন?'

'থাষ্ট নাইন।'

'ফাইন। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে এক কাপ কফি খেতে আসুন না।'

'ইফ ইউ সে, নিশ্চয়ই আসব নয়ত কফি খাবার বিশেষ প্রয়োজন নেই আমার।'

'কাম অন। আমি আপনাকে বেষ্ট কোয়ালিটি ইণ্ডিয়ান কফি খাওয়াব।'

রীণা হাসে। বলে, আসছি।

টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে রাখতেই রীণার মনে

থ্রি-জিরো সেভেনের দরজার পাশে বেল বাজাতেই একজন মহিলা দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানালেন, গুড মর্নিং!

'গুড মর্নিং!' রীণা সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বললো, আমি মিস চাউডারী। এ্যাণ্ড আই এ'ম সিওর আপনি মিসেস কার।

মিসেস কার রীণার মুখের কাছে মুখ নিয়ে একটু চাপা গলায় বললেন, অন্য কোন মেয়েকে এ ঘরে আশা করেছিলেন নাকি।

'নেভার।'

'কাম এ্যালঙ। মীট মাই গ্রেট হাসব্যাণ্ড।'

পাতলা ফোমড্ রাবারের উপর মোটা কার্পেটে পা ফেলে এগুতে না এগুতেই রীণা আর মিঃ কার একই সঙ্গে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন।

'গুড মর্নিং মিঃ কার।'

গুড মর্নিং মিস চাওডারী।' বলেই হাসতে হাসতে মিঃ কার জিজ্ঞাসা করলেন, কি? ঠিক উচ্চারণ করেছি তো?

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'প্লীজ ডোণ্ট সে সো। ভারতীয়রা খুব সহজ সরল হলেও ভারতীয় নাম উচ্চারণ করা খুব কঠিন।'

মিসেস কার ইশারা করতেই রীণা বসল। জিজ্ঞাসা করল, আপনি বোধ হয় আরো অনেক ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করছেন, তাই না?

আই সী।

মিঃ কার একটু হেসে বললেন, এমনই মজার ব্যাপার যে এই শিখরাই পাকিস্তান বর্ডারের পাশের ইণ্ডিয়ান প্রভিন্স পাঞ্জাবে থাকে।

মিসেস কার একবার কিছুটা বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে শিখ দারোয়ানটিকে দেখতে না দেখতে গাড়ী এলো। রীণা বললো, এক্সকিউজ মী, আমাদের গাড়ী এসে গেছে।

মিঃ ও মিসেস কার গাড়ীর সামনে আসতেই অজিত সিং বিদ্যুৎ গতিতে পিছনের দরজা খুলে অভ্যর্থনা করলো, গুড মর্নিং।

মিঃ ও মিসেস কার গাড়ীর মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, গুড। মর্নিং গুড মর্নিং।

অজিত সিং পিছনের দরজা বন্ধ করেই নিজের জায়গায় বসল। রীণা আগেই বসেছে।

হোটেল থেকে গাড়ী বেরিয়ে একটু যেতেই লোদী রোড। গাড়ী পশ্চিমে ঘুরল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো রীণার রানিং কমেন্টারী। ধারা বিবরণী।

…ছোট হোক, বড় হোক সব শহর-নগর গ্রামে গঞ্জেই একটা ইতিহাস আছে, কিন্তু মানব জাতির ইতিহাসের পাতায় চীন-ভারত, মিশর পারস্য, গ্রীস-রোম নিঃসন্দেহে একটু বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। এই দিল্লী শহরের প্রতিটি ধূলিকণায় তিন হাজার বছরের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে।…

শ্রেষ্ঠ ও আধুনিক। ডানদিকে রইল সফদারজং হাসপাতাল……

মিসেস কার জিজ্ঞাসা করলেন, এই সফ্‌দারজাং মুসলমান ছিলেন তো ?

'হ্যাঁ।'

'তাহলে হিন্দু ইণ্ডিয়াতে মুসলমানের নামে হাসপাতাল হলো কেন ?"

রীণা বিদেশী টুরিষ্টদের গাইড। এ ধরনের প্রশ্ন ওর কাছে নতুন নয়। অনেক বিদেশী আসেন যারা জানেন না ভারতবর্ষে মুসলমানরাও থাকেন। শোনেন নি এদেশের মুসলমানরাও ব্যবসা বাণিজ্য করে কোটিপতি হন, বিধান সভা-পার্লামেণ্টের সদস্য হন, মন্ত্রী—গভর্ণর হন সৈন্য বাহিনীতে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছেন। বহু বিদেশীর ধারণা হিন্দু ভারতবর্ষে মুসলমানদের স্থান নেই। রীণা সবাইকে বলে, দারিদ্র্যের জ্বালা ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান বা অন্যান্য সবাইকে ভোগ করতে হয়, কিন্তু ভুলে যাবেন না। ভারতবর্ষে যত মুসলমান বাস করেন, মধ্য প্রচ্যের অনেক দেশেও অত মুসলমান নেই। শুনে অনেকেই বলেন, হোয়াট ?

'ইয়েস স্যার, যা বলছি ঠিকই বলছি। ইণ্ডিয়ার মুসলীম পপুলেশন ফ্রান্সের সমগ্র জনসংখ্যার চাইতে সামান্য কম—ডেনমার্কের টোটাল পপুলেশনের প্রায় চার গুণ।

'সত্যি ?'

'হ্যাঁ স্যার আমি ঠিকই বলছি। আমাদের দেশের ক্রিশ্চিয়ানদেরই জনসংখ্যা ডেনমার্কের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ।'

রীণা সাধারণ টুরিষ্ট গাইড। কুতুব মিনার-লালকেল্লা, জুম্মা মসজিদের ইতিহাস গড় গড় করে বলে যায়। ঘুরিয়ে দেখায় কনট প্লেস-পার্লামেন্ট হাউস, রাষ্ট্রপতি ভবন রাজনীতি বা সরকারী ব্যাপার কিছু জানে না, বুঝেও না কিন্তু মাঝে মাঝেই মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা অনেক ভীড় করে—ভারতবর্ষ সম্পর্কে সাধারণ কথাগুলিও কি পৃথিবীর মানুষকে আমরা জানাতে পারি না? আমাদের এম্ব্যাসীগুলো করে কি?

এত কথা রীণ মিসেস কারকে বলে না। শুধু বলে, হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামেই বহু রাস্তা ঘাট, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, হোটেল, জাহাজ ইত্যাদির নামকরণ করা হয়েছে।

কুতুব মিনার ও তার চারপাশের ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভগুলো নিয়েই একটা মোটা ইতিহাস লেখা যায়। এছাড়া কত উপন্যাসের উপকরণ যে ওখানে ছড়িয়ে আছে তার হদিস কেউ জানেন না। বোধহয় জানার অবকাশও নেই। রাই পিথোরার মন্দিরের পূজারিণীদের রূপের মোহে কুতুব উদ্দীন আইবকের কয়েকজন বিশিষ্ট সেনাপতি কিছুদিন বিনিদ্র রজনী কাটাবার পর আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না। কামাতুর সেনাপতিরা শেষ পর্যন্ত রাই পিথোরার মন্দিরটিই ধ্বংস করলেন। সেখানেই মাথা তুলে দাঁড়াল অতুলনীয় কুয়াত-উল-ইসলাম মসজিদ। দেড়শ' বছর পরে ইবন বতুতা এ মসজিদ দেখে মন্তব্য করেন শিল্পনৈপুণ্যে এর তুলনা বিরল। আলাউদ্দীন এই মসজিদের আরো সম্প্রসারণ করেন এবং কবি আমীর খসরু পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যান। রাই পিথোরার মন্দির মাটির তলায় লুকিয়ে রইল, লুকিয়ে রইল মানুষের দৃষ্টি থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে মিসেস কার বললেন, ইফ ইউ ক্যান ম্যানেজ তাহলে আমি সপ্তাহ খানেক দিল্লীতে কাটাতে পারি।

শুধু কুতব মিনার, লাল কেল্লা, জুম্মা মসজিদ, রাজঘাট, শান্তি বন মন্তর মন্তর কনট প্লেস নয়, শুধু হিসাব মত সকালে সাড়ে তিন ঘণ্টা, লঞ্চের পর সাড়ে তিন ঘণ্টা নয়, তিন দিন রীণা ওদের সঙ্গে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাটাল। রাত্রে ডিনারের পর অজিত সিংহ' এর গাড়ীতেই বাড়ী ফিরত।

শনিবার সকালের ফ্লাইটে ওরা আগ্রা যাবেন। শুক্রবার রাত্রে মুঘল রুমে ডিনার খেতে খেতে মিসেস কার বললেলন, তিনটে দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তা টেরই পেলাম না এ্যাণ্ড আই মাষ্ট সে—আপনার জন্য প্রতিটি সেকেণ্ডেও উপভোগ করছি।

'আই এ্যাম গ্লাড ইউ হ্যাভ এনজয়েড ইওর ষ্টে হিয়ার কিন্তু এতে কোন কৃতিত্ব নেই। ইন ফ্যাক্ট আপনাদের মত ভিজিটার্সদের সঙ্গে তিন দিন কাটিয়ে আমার মন ভরে গেছে।'

মিঃ কার শুধু বললেন, আমার স্ত্রী যখন আপনার প্রশংসা করছেন তখন আমার চুপ করে থাকাই ভাল, কি বলেন?

রীণা ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট অটোগ্রাফের খাতা বের করে ওদের দুজনের অটোগ্রাফ নিল। মিঃ কার সঙ্গে সঙ্গে পার্স থেকে থেকে দুটো একশ' টাকার নোট বের করে রীণার হাতে দিয়ে বললেন, ডোণ্ট মাইণ্ড।

রীণা হাতের মুঠোয় নোট দুটো নিয়ে বললো, এসব দেবার কোন দরকার ছিল না।

॥ দুই ॥

অনেক কাল আগেকার কথা। ইংরেজ আমল। নিউ দিল্লী তখন তাইসরয় হাউসের চারপাশেই সীমাবদ্ধ ছিল। পালাম-মেহেরলি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে নি। অশোক হোটেলের জমিতে বাঘ না থাকলেও মানুষের অগম্য ছিল। সেকালে দিল্লীর সিসিল আর নিউ দিল্লীর ইম্পিরিয়াল হোটেলের খ্যাতি টেমস' এর পাড়ে হাউস অভ্ কমন্সের লবীতে পর্যন্ত শোনা যেত। ভাইসরয় এর স্ত্রী যখন তখন বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে কফি খেতে আসতেন ইম্পিরিয়ালে, সাঁতার কাটতে যেতেন সিসিলের সুইমিং পুলে। গান্ধীজি বিড়লা হাউস বা ভাঙ্গী কলোনীতে থাকলেও জিন্না দিল্লীতে এলেই ইম্পিরিয়্যালে থাকতেন। লণ্ডন থেকে হাউ অফ্ লর্ডস বা কমন্সের কোন মাননীয় সদস্য দিল্লী এলেই ভাইসরয় তাঁকে নিয়ে সিসিলে লাঞ্চ আর ইম্পিরিয়্যালে ডিনার খেতে আসছেন। ইম্পিরিয়াল হোটেলের সেই স্বর্ণযুগের শেষ অধ্যায়ে অশোক চৌধুরী এখানে কর্মজীবন শুরু করলেন।

ভারতবর্ষের ভাগ্য বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অশোক চৌধুরীর জীবনেও পরিবর্তন হলো। ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে একদিন ফ্রন্ট অফিসের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার হলেন। কর্মজীবনে উন্নতির

সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমানে ভাঙ্গা বাড়ী দোতালা করলেন, দুটি বোনের বিয়ে দিলেন। ছোট ভাইকেও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করে দিলেন। অফিস আর সংসারের কর্তব্য পালন করতে বেশ ক'টা বছর পার হয়ে গেল।

তারপর একদিন অশোক চৌধুরী দিল্লী ছেড়ে চলে গেলেন হোটেলে। বেশী দিন থাকতে পারলেন না। নতুন চাকুরী নিয়ে চলে গেলেন বোম্বে থেকে কলকাতা থেকে আবার শ্রীনগর। যৌবন হারাবার বহুকাল পরে, প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি অশোক চৌধুরীর হঠাৎ একদিন সিসিল হোটেলের একদা পরিচিত মিস সরলা ভার্মাকে বিয়ে করলেন। এই শ্রীনগরেই রীণার জন্ম। রীণার যখন চার বছর বয়স তখন ওর মা একদিন হারিয়ে গেলেন। অনেক কাল পরে, বড় হবার পর ও জেনেছে একজন আর্মি অফিসারের সঙ্গে মা শ্রীনগর থেকে হায়দ্রাবাদ চলে যান। চার বছরের শিশু রীণা কিছু না জানলেও শ্রীনগরের সবাই এ খবর জানতেন। অশোক চৌধুরী আর শ্রীনগরে থাকতে পারলে না। চলে এলেন দিল্লী।

অনেকে অনেক রকম পরামর্শ দিলেন। কেউ বললেন ফরগেট দ্যা পাষ্ট। আবার বিয়ে কর।

মিঃ চৌধুরী বললেন, না তা আর হয় না।

'হবে না কেন? তোমার মত লোককে বিয়ে করতে পারলে যে কোন মেয়েই সুখী হবে।'

'না বিয়ে করার সখ মিটে গেছে।'

টেবিলের উপর বই-খাতা রেখে রীণা গম্ভীর হয়ে বিহারীলালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তার মানে ?

বিহারীলাল ওর খাবার ঠিক করতে করতে নির্বিকার হয়ে বললো, তার মানে তুমি পিকনিকে যাবে না।

দুদ দাম পা ফেলে রীণা ওর সামনে এসে বেশ রাগ করেই একটু চড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, কেন যাব না শুনি !

বিহারীলালও ভ্রু কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বললো, পুলিশ কনষ্টেবলদের মত ঐভাবে দুম দাম করে এসে এভাবে মেজাজ দেখিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবে না

ব্যস। রীণা আর এগুতে সাহস করল না। ব্রেক কষল। কোন কথা না বল বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে খাবার দাবার খেয়ে নেবার পর মুখ নীচু করে জিজ্ঞাসা করল, কাল আমি পিকনিকে যাব কালোদা ?

'না দিদি, এখন তুমি পিকনিকে যাবে না। পরীক্ষা হয়ে যাক, তারপর প্রাণ ভরে আনন্দ করো।' বিহারীলাল রীণার কাছে এসে বললো, তাছাড়া তোমাকে নিয়ে কালকে আমার একটু বেরুতে হবে।

সব সময় খুশী না হলেও বিহারীলালের বিরুদ্ধে বাবার কাছে নালিশ করার কথা রীণা কখনও ভাবেনি। কখনও রাগ করে খায়নি। বিহারীলালও খায়নি। শেষ পর্যন্ত রীণাকেই হারাতে হয়েছে। 'কি কালোদা, তোমার ক্ষিদে পায়নি ?'

'না।'

জামা-কাপড় কেনা কাটা করবে। তারপর রীণা ওর বাবার সঙ্গে গিয়ে বিহারীলালের জন্য নতুন জামা কাপড় কিনে আনে।

'দিদি, এটা কি কাণ্ড করেছ বলতো ?

'কেন ? কি হলো কালোদা ?'

'আমাকে দেখতে কালো বলে তুমি কালোদা বলে ডাক অথচ এই জামা কিনে আনলে ?'

রীণা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে, কেন কালোদা, এ জামা তোমাকে মানাবে না ?

'আমার মত ভূতকে এই জামায় মানায় ?'

'দারুণ মানাবে কালোদা, দারুণ !

'এ রকম জামা তোমার বিয়ের দিন পরাব ।'

'আমার বিয়ের দিন এত দামী জামা পড়লে আমার বর তোমার মাথা ফাটিয়ে দেবে।'

রীণা আর চৌধুরী সাহেব ফিরে আসার আগের দিন বিহারী লাল ফিরে আসবেই। ঝিকে দিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার করাবে। বাজার হাট করবে। ভাল ভাল রান্না করে ফ্রিজে রাখবে। তারপর কাউল সাহেবকে ফোন করে অফিস থেকে গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে যাবে।

মিঃ চৌধুরীকে প্রণাম করে বিহারীলাল রীণাকে কাছে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই রীণা বলে, তোমার একি চেহারা হয়েছে কালোদা ?

বিহারীলাল একটু হাসে। বলে, ক্ষেত-খামারে কাজ করলে চেহারা তো একটু·····

যাও তো কালোদা। তোমাকে আর সৎ পরামর্শ দিতে হবে না।

মিঃ চৌধুরী বললেন, তুই যদি এম, এ, না পড়িস তাহলে আমিও ভাবছি তোর বিয়ের চেষ্টা করব। তোর একটা ভাল বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত—

রীণা আর দাঁড়াল না। ভিতরে চলে গেল।

রেজাল্ট বেরুবার আগে পর্যন্ত আরো কয়েকজনের সঙ্গে অনেক রকম আলাপ আলোচনার পর শেষে কাউল সাহেবের পরামর্শ মত রীণা গাইড হলো। টুরিষ্ট ডিপার্টমেণ্টের মামুলি পরীক্ষা। পাশ করতে কষ্ট হলো না। কাজটা ইণ্টারেস্টিং। কোন বাধ্যবাধকতা না থাকলেও আয় হবে। বাড়ীতে বসে থাকতে হবে না। অনেক চাকুরির চাইতে ভাল আয় হলেও যখন তখন ছেড়ে দেওয়া যাবে। মিঃ চৌধুরীও আপত্তি করলেন না। বিহারীলালের খুব বেশী মত ছিল না। মিঃ চৌধুরীকে বললো সাহেবদের সঙ্গে দিদির ঘুরে বেড়ান কি ভাল হবে।

'সাধারণ টুরিষ্টদের সঙ্গে তো আমি ওকে যেতে দেব না তাছাড়া মনোহরও অফিসে বলে দিয়েছে ভাল ভাল শিক্ষিত লোকদের সঙ্গেই ওকে পাঠাতে।'

'মাঝে মাঝে কি আমি দিদির সঙ্গে যেতে পারব?'

মিঃ চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন, না বিহারী, তা হয় না।

হাসে। বলে, তা আমি জানি দিদি তবু বাড়ীর বাইরে থাকলেই হাজার রকম আজেবাজে চিন্তা মনে আসে।

'আচ্ছা কালোদা·····

'কথা পরে বলো। আগে দুধ খেয়ে নাও।'

রীণা বিহারীলালের গলা থেকে হাত ছাড়িয়ে বললো, আমার মত ধেড়ে মেয়ে কোন বাড়ীতে দুধ খায় না।

'আজকালকার মেয়েদের কথা আর বলো না। ওরা বোধ হয় সিগরেটও খায়।'

'বোধহয় কি গো কালোদা, সত্যি সত্যিই অনেক মেয়ে সিগরেট খায়।'

'ওদের সিগরেট খাবার কথা আর আমাকে শোনাতে হবে তা। তুমি এখন দুধ খেয়ে নাও।'

রীণা দুধ খেয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাবা কোথায়?

'তোমার গাড়ী আসছে কি না দেখার জন্য সামনের লনে হাঁটাহাঁটি করছেন।

রাণী হাতের ঘড়িটা দেখে বললো, গাড়ী আসার এখনও আধ ঘণ্টা দেরী আছে অথচ·····

বিহারীলাল একটু হেসে বললো, দিদি, সাহেব তা বেশী কথা বলেন না কিন্তু আমি জানি উনি তোমার জন্য কত ভাবেন।

'তা আর আমি জানি না?"

'আজ সাহেব কখন উঠেছেন জান?'

'কখন?'

'সাড়ে পাঁচটায়।'

'কেন আবার? তুমি আজ সকাল বেরুবে বলে।'

'জান কালোদা, আমার সঙ্গে মার যদি কোন দিন দেখা হয় তাহলে.....

বিহারীলাল এগিয়ে এসে রীণার মাথায় হাত দিয়ে বললো আঃ! দিদি, আজ আর এসব তোমাকে ভাবতে হবে না। আজকে নতুন কাজে যাচ্ছ, আজ আর মন খারাপ করো না।

'বাবার কথা ভাবলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায় কালোদা। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারি না।'

তা আমি জানি দিদি কিন্তু যেসব কথা ভেবে লাভ নেই তা ভেবো না। সাহেব জানতে পারলে খুব দুঃখ পাবেন'

দরজার ওপাশ থেকে মিঃ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে রীণা, তৈরী হয়েছিস?

ঘরের ভিতর থেকেই ও জবাব দিল, এক্ষুনি আসছি বাবা।

'তাড়াতাড়ি নে। এক্ষুনি গাড়ী এসে যাবে।'

দু'এক মিনিট পরে রীণা ঘর থেকে বেরিয়েই ওর বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি আজ সাড়ে পাঁচটায় উঠেছ?

উঠেছি মানে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মিট মিট করে হাসতে হাসতে রীণা বললো, ঠিক আজই তোমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাই না বাবা?

মিঃ চৌধুরী মেয়ের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দুধ খেয়েছিস?

'শুধু দুধ কেন, কি কি খেয়েছি তা তো তুমি ভোর বেলায় উঠেই.....

আর তো কিছু করিনি। দেখিস না বিহারী, রীণা তোর কাছেই আব্দার করে, আমাকে কখন ও কিছু বলে।'

'জানেন সাহেব, দিদি আমাকে কি বলেছে?'

'কি?'

'বলেছে কালোদা, আমি এমন কাজ কখনো করব না যাতে তোমার বা বাবার মনে দুঃখ লাগে।'

মিঃ চৌধুরী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, ঐ মায়ের পেটে এমন মেয়ে জন্মাল কেমন করে রে বিহারী?

MD. O. M. AKAS
ARCHIVES & RESEARCH
[illegible]

'ফার্স্ট অক্টোবর রওনা হয়ে কবে আবার ফিরতে চান ?'

'অক্টোবর-নভেম্বর আমরা বাইরে থাকতে চাই।'

'দ্যাটস ফাইন। ডিলুক্স ফাইভ ষ্টার হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করব নাকি—

'অফ কোর্স। ভালো হোটেলে না থাকলে এতদিন ধরে ঘুরব কি করে ?'

'দুঃখের কথা কি জানেন ম্যাম, ঘুরতে বেরিয়েও সবাই আনন্দ করতে জানেন না—

'কোন কোন জায়গা সম্পর্কে আপনার স্পেশাল ইন্টারেষ্ট আছে জানলে ভাল হয়।'

'আমি নিজে পাঁচ বছর লণ্ডনে কাটিয়েছি। আমার স্বামীও অনেক কাল ওখানে ছিলেন এবং আমার সন্দেহ হয় ওখানে ওর অনেক গার্ল ফ্রেণ্ডস্ আছে। সেজন্য লণ্ডন সম্পর্কে আমার বিশেষ আগ্রহ নেই—

'ম্যাম, আপনি গোপন পারিবারিক খবর জানিয়ে দিলেন যে—

'এটা কোন খবরই না। বিয়ের আগে সব ছেলের গার্ল ফ্রেণ্ড থাকে তবে ওয়াইফ হয়ে স্বামীকে তো আর ওদের কাছাকাছি যেতে দিতে পারি না।'

ঐ টেলিফোনেই মিসেস কুপার বলে দিলেন সব কিছু। ব্রাসেলস্ কোপেন হেগেন, আমসষ্টারডাম, প্যারিস, জেনেভা, বার্লিন, বেলগ্রেড ও রোমে একদিন করে। প্যারিসে দুদিন হলেও আপত্তি নেই। এর পর ইস্তাম্বুল, আনকারা, দামাস্কাস, বাগদাদ, কায়রো, করাচীতে দুদিন করে কাটাবার পর ইণ্ডিয়া।

কুপারের কাছে। স্বামী-স্ত্রীর পরামর্শের পর ওদের সিদ্ধান্ত জানান হলো। তারপর প্যান আমেরিকান, বি-ও-এ-সি, এয়ার ইণ্ডিয়া, জাপান এয়ারলাইন্সের নিউ ইয়র্ক দপ্তর মারফত টেলেক্সে খবর ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর কোণায় কোণায়। কেবল রিপাবলিক্যান ট্রাভেল সার্ভিস থেকে দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর, শ্রীনগর, বোম্বে, ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ দেখার ব্যবস্থা করল ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বুকিং, হোটেল বুকিং, গাড়ী গাইডের ব্যবস্থাও হলো।

ঠিক দশদিন পরে মিসেস কুপার ইণ্টার-কন্টিনেণ্টাল ট্রাভেলস্ থেকে টেলিফোন পেলেন, ম্যাম উই আর রেডি। আপনাদের পৃথিবী পরিভ্রমণের সব ব্যবস্থা পাকা।

'এভরিথিং।'

'হ্যাঁ ম্যাডাম এভরিথিং। এ টু জেড এ্যাবাউট ইওর ট্রাভেল'

'ভেরী গুড।'

শুধু একটা চেকের বিনিময়ে সবকিছু হয়ে গেল। এ যুগে এমনই হয়। একটি টেলিফোন আর একটি চেক। ব্যস। আর কিছু চাই না, ইচ্ছা ও অর্থ থাকলে পৃথিবী এমন হাতের মুঠোয়।

প্রায় রোজই রীণা এক বা একাধিক টুরেষ্টের সংস্পর্শে আসে। মনে মনে হিসেব করত দশ পনের বিশ-পঁচিশ তিরিশ-চল্লিশ হাজার—

হাজার হোক ভারতীয় মেয়ে। আর এগুতে পারত না। মাথা ঘুরে যেত। ভাবতেও কষ্ট হতো এরা কত টাকা খরচ

ডক্টর আর মিসেস কুপার ঘণ্টা খানেক ধরে কুতব মিনার দেখতে দেখতে ক্লান্ত হতেই রীণা জিজ্ঞাসা করলে, উড ইউ কেয়ার ফর এ কোল্ড ড্রিঙ্ক ?

মিসেস কুপার বললেন, খুব ভাল হয়। সঙ্গে সঙ্গে হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে একটা ডলার, বের করেই বললেন, এই নিন।

'না, না, থাক।'

'কেন ? আপনি কেন কোকের দাম দেবেন ?'

রীণা কিছুতেই নিল না। নিজের হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে মহীন্দর সিংকে দিয়ে বললো, ভাইসাব, চারটে কোকা আনবেন ?

কোকাকোলা এলো খাওয়া হলো। আবার ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করার পর মিসেস কুপার জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে পিক্‌চার পোষ্টকার্ড পাব না ?

'নিশ্চয়ই পাবেন। আপনি যাবেন নাকি আমি আনব ?'

'আমরা আরো কয়েকটা ছবি তুলি। আপনিই ছ'টা-আটটা পিক্‌চার পোষ্টকার্ড নিয়ে আসুন।' মিসেস কুপার পাঁচ ডলারের একটা নোট বের করতেই মহীন্দর সিং রীণাকে ইসারা করল।

রীণা আর মহীন্দর সিং পিক্‌চার পোষ্টকার্ড কেনার জন্য একটু এগুলোতে মহীন্দর খুব আস্তে আস্তে বললো, বহিনজী, ডলারটা দিন আর এই টাকা নিন।

রীণা ডলার দিল, টাকা নিল। সে টাকায় পিক্‌চার

পোষ্টকার্ড কিনল। তারপর মহীন্দর বললো, এদের কাছে ডলারই থাকে কিন্তু ডলার দিয়ে তো কোকাকোলা বা পোষ্ট-কার্ড কেনা যাবে না।

'তা তো বটেই।'

'কিন্তু এরা কি এখন ডলার ভাঙ্গাতে হোটেলে বা ব্যাঙ্কে যাবে ?——

'তা তো মুস্কিল।'

'তাইতো গাইডরা ওদের ডলার-পাউণ্ড নিয়ে এ সব সময় টাকা দেয়। না দিলে তো ওদের অসুবিধা হবে।' এবার মহীন্দর সিং হেসে বললো, আপনার কৃপায় আমার দশ-পনের টাকা আয় হলো।'

রীণা হাসে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখন ডলার নিয়ে কি করবেন।

'তিন-চার টাকা বেশী দামে বিক্রী করব।'

'যদি ধরা পড়েন ?'

মহীন্দর হাসতে হাসতে বললো, না বহিনজী, কেউ ধরিয়ে দেবে না। পুলিশ-কাষ্টমস্‌ওয়াদের তো ডলার-পাউণ্ডের দরকার হয়।

কুতব থেকে হোটেলে আসার পর মহীন্দর সিং বললো, সব গাইডই দিনে দশ-পনের ডলার বদলে দিয়ে তিরিশ-চল্লিশ

এম্পায়ার আউরঙ্গজেব এই যে সামনের গেট, আর্চওয়ে ও উপরের ঘরটর তৈরী করেন।

ডক্টর কুপার বললেন, ফোরওয়াক ইজ রিয়েলি বিউটিফুল।

রীণা বললো, ইন ফ্যাক্ট এই ফোরওয়ার্কের জন্ত লালকেল্লার সৌন্দর্য অনেক বেড়ে গেছে।

'একশ' বার।'

.....যমুনা পারের এই সমস্ত অঞ্চলটা নিয়েই অসত্র ঐতিহাসিক কাহিনী ছড়িয়ে আছে। এইত একটু দূরেই শ্মশান। নিগমবোধ ঘাট ও দশাশ্বমেধ ঘাট। তবে দশাশ্বমেধ ঘাটের কথা লোকে ভুলে গেছে। যমুনার জলে হারিয়ে গেছে। মহাভারতের মহানায়কে যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে এখানেই অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। যীশুর জন্মের দেড় হাজার বছর আগেকার ঘটনা।

ফোরওয়ার্ক পেরিয়েই সামনে লন। পূর্ব দিকের দেওয়ালের কাছে নহবত খানা। নক্করখানা। রাজ পরিবারের লোকজন ছাড়া সবাইকে এখানেই ঘোড়া থেকে নামতে হতো। আরো খানিকটা এগিয়ে গেলেই দেওয়ান-ই আম। দেয়ান-ই আমের সর্বাঙ্গ হাতির দাঁত—আইভরির অতি সুক্ষ্ম কাজ দিয়ে মোড়া ছিল। এখানেই সম্রাটের দরবার বসত।

রীণা উত্তরের দিকে হাত দেখিয়ে বললো দ্যাট ইজ দেওয়ান ই খাস অর্থাৎ হল আফ্ প্রাইভেট অডিয়েন্স। এখানেই ছিল ঐতিহাসিক পিকক্ থোন। ময়ুর সিংহাসন। ১৭৩৯ সালের

শিরচ্ছেদ হবার আর্তনাদে ভরে গেছে চারদিক। কি হয়নি এখানে? দেওয়ান ই খাসের আত্মজীবনীর প্রায় শেষ অধ্যায়ে দেখা যাবে গুলাম কাদির নৃশংসভাবে সম্রাট শাহ আলমকে এখানেই অন্ধ করেন প্রকাশ্য দিনের আলোয়। বেশ কিছুকাল আগে নাদির শা দেওয়া-ই আম ও দেওয়ান ই-খাসের শ্বেত পাথরের শুভ্রতা কলঙ্কিত করেছিলেন আরো হিংস্রভাবে।

সব দেশের ইতিহাসের পাতায় পাতায় এসব কাহিনীতে ভরা। মিশর, গ্রীস, রোম, ইংল্যাণ্ড সর্বত্র। কিন্তু এসব কাহিনীকে ম্লান করে দিয়েছে লালকেল্লার স্থাপত্য ও শিল্প নৈপুণ্যের খ্যাতি প্রকৃতির শত শত বছরের অত্যাচার উপেক্ষা করে আজও সে আপন মাধুর্যে পৃথিবীর মানুষকে মুগ্ধ করে।

মিসেস কুপার বললেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই মিস চৌধুরী।

o o o

ফুল-ডে সাইট-সিইং এর মাঝখানে লাঞ্চ ব্রেক। মহীন্দর সিং তখন নিজের কথা বলে।

দেশটা যখন দু'টুকরো হলো তখন ওর বয়স মাত্র দশ। লালকেল্লায় এখন মোটর নিয়ে মহীন্দর সিং প্রায় রোজ যায়, তখন নিঃসম্বল ভিখারী হয়ে এই লালকেল্লাতেই আশ্রয় নিয়েছিল ওরা সবাই। পাঞ্জাব-সিন্ধু-সীমান্ত প্রদেশের হাজার হাজার রিক্ত নিঃস্ব মানুষের দল। যেখানে এককালে মোগল সম্রাটরা সমস্ত ঐশ্বর্য

সুযোগ তো পায়নি। পেতে পারে না। এত অভিজ্ঞতা এত বৈচিত্র শুধু গাইড হলেই সম্ভব।

সেদিনের সেই সর্বহারা মহীন্দর অনেক অলি-গলি রাজপথ-জনপথ ঘুরে টুরিষ্ট ট্যাক্সির ড্রাইভার হয়েছে। কয়েক বছর স্কুলে যাতায়াত করলেও এগুতে পারেনি। এখন মহীন্দর গড় গড় করে ইংরেজী বলে। মেসফিল্ড সাহেব মহীন্দরের ইংরেজী শুনলে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করতেন কিন্তু তার জন্য ওর কোন দুশ্চিন্তা নেই। প্রথম প্রথম রীণা ওর ভুল ইংরেজী শুনে হাসত। মহীন্দর বলতো, বহিনজী, আপনাদের মত মোটা মোটা কেতাব পড়ে তো ইংরেজী শিখিনি যে ঠিক করে বলব। তবে সাহেব-মেমসাহেবের কথা আমি বুঝতে পারি, সব সাহেব মেমসাহেবাও আমার কথা বুঝতে পারে। আর কি চাই?

'না, না, তার জন্য কিছু বলছি না।'

মহীন্দর আগে অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়েছে, দু'টুকরো রুটির জন্য অনেক পথে-বিপথে বিচরণ করলেও জীবন দেখল টুরিষ্ট গাড়ীর ড্রাইভার হয়ে। রীণা শুধু ভাল ভাল শিক্ষিত টুরিষ্টদের গাইড হয় কিন্তু মহীন্দরকে তো সব রকম টুরিষ্টদের নিয়েই ঘুরতে হয়। ঘুরতে হয় দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর উদয়পুর, গোয়ালিয়র, খাজুরাহো। এছাড়া মাঝে মাঝেই যেতে হয় আলমরা নৈনীতাল, ল্যান্সাডাউন, ডালহৌসী, সোলন সিমলা,

এদিককার কোথায় কোন মন্দির-মসজিদ দুর্গ বা প্রসাদ ছড়িয়ে আছে, তা ওর মুখস্ত।

একজন সাহেব মহীন্দরের কথা ঠিক বিশ্বাস করলেন না। বললেন, এখানে বড় প্যালেস বা ফোর্ট থাকবে কেন?

'হ্যাঁ স্যার আছে। যাবার পথে দেখিয়ে দেব।'

'না, না, তার দরকার নেই। তাহলে খাজুরাহো পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে।

'না স্যার, খাজুরোহো পৌঁছতে দেরী হবে না।'

সত্যি মহীন্দর একটা প্রাসাদ আর দুর্গ ওদের দেখলো কিন্তু বলতে পারলো এই ছোট্ট ওরছা গ্রামেই এককালে ওরছা রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা বীর বিক্রম দেও এই দুর্গ নির্মাণ করেন। আর এই যে প্রাসাদ। এটি মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের জন্য তৈরী করা হলেও উনি কোনদিন ব্যবহার করতে পারেননি। একথা ও বলতে পারলে না যে ওরছার রাজাই বুন্দেলা-প্রাসাদ এবং ভিন্দেলা থেকেই বুন্দেলা এসেছে। বুন্দেলখণ্ড, বুন্দেল শহর এই বুন্দেলাদেরই কেন্দ্র করে একদিন গড়ে উঠেছিল।

ওরছা থেকে ষাট মাইল দক্ষিণে তিকমগড় খাজুরাহো যাবার পথে ওটা পড়বে না। খাজুরাহো যাবার পথে সাত

মাইল পর আসবে বারওয়া-সাগর। পাহাড়ের নীচে ছোট্ট সুন্দর শহর। ওরছা রাজাদের তৈরী লেক আছে। এরই মাইল তিনেক পশ্চিমে আছে চান্দেলের বিখ্যাত মন্দির। শিল্পরসিক মানুষের দল খাজুরাহো-কোনার্ক, অজন্তা ইলোরা দেখে মুগ্ধ হন, বিস্মিত হন। এরা যদি চান্দেলের মন্দির দেখেন তাহলে বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। ঝান্সী থেকে ঠিক তেত্রিশ মাইল পর হচ্ছে মাও-রাণীপুর। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জায়গা। নোংরা শহর হলেও এখানকার ঘর-বাড়ীর একটা বৈশিষ্ট আছে। বুন্দেলখণ্ড ছাড়া আর কোথাও এ ধরণের ছাদ আর ঝুল বারান্দা দেখা যাবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হলেও জৈন মন্দির আর সুন্দর সুন্দর বাগিচা এ শহরের আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে। এখানে একটা সুন্দর ডাকবাংলা ছাড়াও ইনস্পেক্শন বাংলো আছে। এরপর পড়বে হরপালপুর, বেলা-ডাল। তারপর মাহোবা।

'জান, বহিনজী, একবার তিনজন সাহেব আর একজন মেমসাহেবকে নিয়ে আমি মাহোবা গিয়েছিলাম। সাতদিন ওখানে ছিলাম।' মহীন্দর একটু হেসে কি যেন বলতে গিয়েও বললো না।

'তা হাসছেন কেন?'

'বহিনজী, সে কথা আপনাকে বলা মুস্কিল। মানে কোন মেয়েকেই বলা যাবে না।'

ওর অভিজ্ঞতার ঝুলিতে জমা হয়েছে কর্মজীবন আর সংসারের চার দেয়ালের বাইরে এলেই মানুষগুলো কেমন পাল্টে যায়। সামাজিক অনুশাসনের বাইরে অধিকাংশ মানুষেরই চেহারা পাল্টে যায়। মানুষগুলো হাঙ্গর হয় অর্থের বিনিময়ে গিলে খেতে চায় সব কিছু। সেই ক্ষুধার্ত হিংস্র মানুষগুলোর শিকার হয়েও জলি কাশ্যপ বলে, ওরা বাণ্ডিল বাণ্ডিল ডলার-পাউণ্ড ওড়াতে আসে আমি কিছু কুড়িয়ে নিয়ে কি অন্যায় করছি ?

রীণা হাসতে হাসতে বলে, গুড গড !

———

তাকিয়ে দেখলাম গলার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে ওপর দিকে। বুকের ওপরের শিরা উপশিরাগুলো নীলচে হয়ে যেন ধুঁকছে চামড়ার নীচে। এই মুহূর্তে ভীষণ কষ্ট হোল ওকে দেখে। ভাবলাম সত্যি বুঝি ওর মতো দুঃখী আর কেউ নেই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ রইলাম দুজনে। ও দু'চোখ বন্ধ করে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে রইলো খানিকক্ষণ আমি হতবাক হয়ে ঘরের চার দেয়ালে চোখ বোলাতে লাগলাম। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ছবি ঝুলছে। ফটোর কোণায় অবশিষ্ট ধূপকাঠির টুকরো। একপাশে ছোট টেবিলে কতগুলি উলঙ্গ ছেলেমেয়ের বিভিন্ন ভংগীমার ছবি। দু'একটা খালি গ্লাস কাগজে মোড়ানো কিছু তেলেভাজার টুকরো। অসংখ্য পিঁপড়ে ছেয়ে ফেলেছে কাগজটিকে। ঘরের এককোণে কতগুলি প্লাষ্টিকের ফুল। একটা 'শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ' লেখা বাচ্চার ক্যালেণ্ডারে। পাতা ফুলগুলোকে বার বার ঝাপটা দিচ্ছে বাতাসে

অনেকক্ষণ বসে বসে পা ঝি-ঝি করছিল। একটু নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসতেই হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়লো বকুল বৌদি।

—ছি ছি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তোমার কোলে, ডেকে দাওনি কেন শাজা। শশব্যস্ত হয়ে জামা কাপড় ঠিক করতে করতে উঠে পরলো ও। তারপর হঠাৎ মুচকি হেসে বললো খাবে নাকি কিছু। মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালাম কিন্তু কোন কথাই শুনতে চাইল না।

মাথা দোলাতে দোলাতে বললো—তাহলে বুঝবো তুমি রাগ করেছ। খপ্ করে আমার হাতটা তুলে নিজের বুকে চেপে ধরে বললো—সত্যি করে আমার বুকে হাত দিয়ে বলতো তুমি রাগ করনি ?

আমি হকচকিয়ে উঠলাম। পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বল্লাম—ঠিক আছে এই নাও কিছু নিয়ে এসো। দশ টাকার নোট দেখে ঠোঁট উল্টালো বকুল বৌদি, চোখ নাচাতে নাচাতে বললো—মোটে একটা ? ওতে কিছুই হবে না। সখা আরেকটু বেশী মালকড়ি না ছাড়লে রাত্রিটা যে কিছুতেই পোহাতে চাইবে না মাইরী।

শেষের কথাগুলো সুর করে বলছিল বকুল বৌদি। ওর হাতে আরো কিছু দিতেই কেমন একটা শব্দ করলো ও আর এমনি তের চৌদ্দ বছরের একটা ছেলে এসে হাজির টাকাগুলো গুজে কি যেন বুঝিয়ে দিতেই ছেলেটা ছুটে গেল বাইরে

বকুল বৌদি আবার কোলে ঢলে পড়লো। আমি ওর এলেবেলে চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বল্লাম—তোমার এ জীবন ভাল লাগে বকুল বৌদি ?

কথাশুনে আচমকা আমার মুখ চেপে ধরে বলে—আমাকে ও নামে ডেকো না শাজা। তোমার বকুল বৌদি অনেক আগে মারা

গজেনও ঠিক তোমার মতো প্রথম আমার দিকে তাকাতে লজ্জা পেত। ওই আবার কি ভীষণ মারতো তা তোমাকে বোঝাতে পারবো না। কোন কারণই ছিল না, খামোকা এসেই গাল মন্দ করতো আর মারতো। আগে আগে ভীষণ কাঁদতাম। পা জড়িয়ে ধরে থাকতাম। তবু মরদের রাগ কমতো না। গ্যাক গ্যাক করে কয়েকটা লাথি মেরে বলতো—বেরিয়ে যা মাগি আমার বাড়ী থেকে। আমি বুকের ব্যাথায় অজ্ঞান হয়ে যেতাম, ভাবতাম মারবেই যা না কেন হাজার হোক স্বামীর কথা। তারপর ধীরে ধীরে সব সরে যেতে লাগলো, তার সাথে আমিও মদ ধরলাম।

কথা শেষ করে দমকে দমকে হেসে উঠলো বকুল বৌদি। দু'হাতে মাথার চুল দু'পাশে সরিয়ে বললো—আগে আগে সব কিছু কেমন হলুদ হলুদ আর গোল্লা গোল্লা দেখতাম এখন সব সয়ে গেছে। মাইরী বলছি আজকাল আর মার খেলে মাতাল হই না। এই ছাখোনা ছাখো, আমি সব কিছু ঠিক ঠিক গুণতে পারি কিনা। এক···দুই···তিন···চার···।

কথা বলতে বলতে ঝিমিয়ে পরে বকুল বৌদি আমার কোলে। ওকে আলতো করে বালিশে শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাই কিন্তু পারি না। মাথার মধ্যে কাপুরুষ শব্দটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, আর বেরোতে পারি না। ঘরের কোণে রাখা কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতে হঠাৎ হাত থেকে গ্লাসটা পড়ে গিয়ে খান খান হয়ে যায়। তা সত্বেও বকুল বৌদি চমকে ওঠে না।

বৌ এনে অবাক করে দিল পাড়া-পড়শীকে। যেমন সুন্দর গায়ের রং তেমনি নধর গড়ন। সব সময়ে সারা মুখে যেন হাসি ঝলকাত নূতন বৌয়ের। রং বেরং শাড়ী ব্লাউজের বাহারে ডগমগ করত বুকের বাহার। দেখতে দেখতে আমরা সবাই কেমন যেন ভক্ত হয়ে গেলাম নূতন বৌদির। ফাঁকা বাড়িটা বৌদির যাদুর স্পর্শে গমগম করে উঠলো কিছু দিনের মধ্যেই। আমরা সবাই নূতন সাথী পেয়ে কি যেন নূতন আস্বাদ পেলাম জীবনে। একদিন বৌদির কাছে না গেলে সারা দিনটাই যেন ব্যর্থ মনে হোত। মনে হোত কি বুঝি হারিয়ে গেল জীবন থেকে। আমরা খুব বেশী যাতায়াত করতাম বলে পিসীমা বৌদিকে নিরর্থক বকাবকি করতেন। বলতেন—মেয়ে মানুষের এত পুরুষ স্বভাব কেন লা! লজ্জাশরমের মাথা খেয়েছিস নাকি।

নূতন বৌদি একটুও রাগ করতেন না বরং মিটি মিটি হাসতো। খুব বেশী বিরক্ত হলে বলতো কেন পিসীমা, ওরা যদি আপনার নিরালা নিঝুম বাড়ীতে এসে একটু আনন্দ করে তো রাগ করেন কেন?

খেঁকিয়ে বলে ওঠে বুড়ী—মরণ আমার! দুহা'তে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে—ছিঃ ছিঃ কি ছেনাল মাগী বৌ হয়ে ঘরে এলোগো। আউ-আউ-আউ লজ্জায় মরে যাই।

বিকৃত মুখ করে পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে ছুটে যেত পিসীমা। তারপর প্রভাতদা এলে সাত-সতের করে লাগাত তার কাছে।

সেই যে মাটির ওপর উবু হয়ে বসে কপাল চাপড়াতে লাগলেন তা থেকে তাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা গেল না।

কিছুদিন যেতে না যেতে বৌদির তলে তলে মুখে কে যেন কয়েক পোচ কাজল লাগিয়ে দিল। ভাল করে খায় না। কারো সাথে কথা বলে না। কেবল সারাক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবে। আমরা ভরসা করে আর আগের মত যেতে পারি না তার কাছে। ঐদিকে পিসীমা শাপশাপন্ত সর্বক্ষণ সহ্য করেও বৌদি কেমন নির্বাক নির্বিকার হয়ে গেল।

প্রভাতদার এ্যাসিস্ট্যান্ট গজেন সরকার এসময় খুব সাহায্য করতে লাগল বৌদিদের। বলা যায় ওরই চেষ্টায় কোম্পানী থেকে পয়সা কড়ি আদায় করে দেওয়া, সময়ে-অসময়ে বাজার হাট করে দেওয়া সব রকম সাহায্যই করে যাচ্ছিল বেশ কয়েক মাস। হঠাৎ একদিন শোনা গেল বৌদি পালিয়েছে। পিসীমার চীৎকারে তাবৎ পাড়া-পড়শী ভীড় করলো দরজায় কিন্তু পাখী তখন উড়ে গেছে গজেনের সাথে অনেক-অনেক দূরে। পিসীমা অন্নজল ত্যাগ করে বিছানায় পড়লেন কিন্তু যে বাঘিনী একবার রক্তের স্বাদ পায় সেকি কখনো আর খাঁচায় ধরা দেয়।

হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠলাম। ভাবনার মাকড়শাটা সবে ঘন করে জাল বুনে চলছিল তেমনি সময় বকুল বৌদি আমাকে চমকে দিল। খেয়ালই করিনি কোন ফাঁকে সে উঠে গিয়ে শাড়ী ব্লাউজ পাল্টে মুখে পাউডারের প্রলেপ জড়িয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দু'চোখে ওর কামনার কাজল. শিথিল করে বাঁধা খোঁপার গুচ্ছ এলিয়ে আছে ঘাড়ের ওপর। বুক দুটো উত্তাল

ভঙ্গীমায় ব্রাউজের শাসনকে না মেনে বেরিয়ে আসতে চাইছে বাইরে। আমি অবাক চোখ মেলে ওর মুখের দিকে তাকাতেই বললো—আচ্ছা শাজা, সত্যি বলতো আমাকে কেমন লাগছে ?

ঢোক গিলে বল্লাম—চমৎকার। দারুণ লাগছে তোমাকে।

—মাইরী বলছ ? আমার বুকে হাত রেখে বলতো ?

বিশ্বাস কর সুন্দর লাগছে তোমাকে।

বৌদি খুশীতে আমার চিবুক স্পর্শ করে চুকচুক্ করে শব্দ তুললো। তারপর এক সময় উবু হয়ে বসে খাটের নীচ থেকে একটা বোতল বার করে ঢকঢক করে বেশ খানিকটা গিলে আমার খুব কাছে এসে বললো—আচ্ছা শাজা, তুমি আমাকে খুব ঘেন্না করছ তাই না ?

আলতো করে ওর হাত দুটি ধরে বল্লাম—আমায় দেখে কি তোমার তাই মনে হয় বৌদি ?

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে বললো—জানিনা কিস্সু জানি না। পুরুষ জাতটায় আমার ভীষণ ঘেন্না ধরে গেছে আজকাল।

অবজ্ঞায় মুখ বাঁকাল বৌদি। ভুরু কুঁচকে বললো—কি জানি বাবা তোমাদের ভালো মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সব কিছুই আজকাল গোলক ধাঁধা মনে হয় আমার।

কথা বললে বলতে আবার নিজেকে এলিয়ে দিল বিছানায়। আমি ওর মাথার নিচের বালিশটা ঠিক করে দিতেই আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরে বললো—জানো রাজা, আমি জীবনে বিস্তর পুরুষ ঘেঁটেছি কিন্তু সত্যিকারের মরদ মানুষ পাইনি একটাও।

এক পলকে বুকের কাপড় সরিয়ে বললো—এই বুকটায় বড্ড হাহাকার রাজা—বড্ড হাহাকার। বিশ্বাস কর আমি টাকা পয়সা চাইনি, শুধু একটু সুখ একটু শান্তি চেয়েছিলাম, চেয়েছিলাম চাঁদের মতো ফুটফুটে একটা শিশু যে টুকুর টুকুর শব্দে কঁচি কঁচি পা ফেলে আমার সংসারকে ভরিয়ে রাখবে আর আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবো। কিন্তু না হলো না। গজেনটা আমায় ফেলে পালিয়ে গেল। বোকা, একেবারে বোকা, ভাবলো না খেতে পেয়ে মাগীটা শুকিয়ে মরবে।

হাঁপাচ্ছিল বকুল বৌদি—তুমি সুস্থ নও এখন একটু ঘুমিয়ে নাও, আমি তোমার চুলের বিনি কেটে দিচ্ছি। আমার কথার উত্তর না দিয়ে বললো—মেয়ে মানুষীর দুঃখ কি বল। গতর থাকলেই আদর, তারপর যদি গতরে মাংস থাকে তবে তো অনেকের কাছেই পাটরাণী তাই না নাগর। কথা শেষ করে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো বকুল বৌদি। ওর সারা মুখে কেমন দুর্গন্ধের ঢেউ। আমি এক রকম জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিতেই আমাকে দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে চোখে চোখ রেখে বললো—আমাকে একটা ভিক্ষা দেবে রাজা শুধু একটা ভিক্ষা।

ওর গলার স্বর অস্বাভাবিক ভারি শোনালো। বল্লাম—ঠিক আছে সব শুনবো। তুমি ঘুমোও পরে সব কথা হবে।

প্রতিচ্ছবি

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে আপনমনেই বলে সুলেখা—সত্যিই এখনো তুই রূপের গর্ব করতে পারিস। পুরুষের মনে আগুন জ্বালাতে পারিস অনায়াসেই।

অথচ রোজই বিকেলে সংসারের কাজের শেষে এ রকম সাজ সজ্জা তো করেই থাকে, কিন্তু আজকের মত মনের অবস্থা তো কখনো হয়নি।

রূপ সৌন্দর্য ওর আছে। মা বাপের প্রথম আদুরে সন্তান। বাবা আদর করে নাম রেখেছিলেন সুলেখা। ওর পরের বোন শ্রীলেখা আর ভাই পল্লব বয়সের অনেক তফাৎ। ওরা হয়েছে বাবার মত আর সুলেখা পেয়েছে মায়ের মুখখানা। হয়তো সেই জন্যই বাপের আদরটা বেশীই পেয়েছে সুলেখা।

সুলেখার শরীরের গঠনে খুঁত ধরতে পারেনি কেউ। গায়ের

রং এই বয়সেও কাচা সোনার মতই রয়েছে, গঠনে ভাঙ্গন ধরেনি এতটুকু। শ্রীলেখা বলে—দিদি বিয়ের সময় যেমনটি ছিলি, এখনো তেমনি রয়েছিস। বরং দিন দিন তোর রূপ যেন খুলছে।

উনিশ বছরে বিয়ে হয়েছে সুলেখার। বিয়ের পরের বছরেই একটি মেয়ে সুলতার বয়েস এখন এগারো।

পোষাক পরিচ্ছেদে চিরকালই ওর বিশেষ একটা রুচিবোধ আছে যা সচরাচর দেখা যায় না।

বাবা বিনয়বাবু দিল্লীর সরকারী চাকুরে। বেশ উচ্চপদেই অধিষ্ঠিত। তিনিও দিল্লীতে মানুষ সুলেখার জন্মও নিজামুদ্দিনের সেই হলুদ তিনতলা বাড়ীটাতে। শিক্ষা-দীক্ষা সবই অবাঙ্গালী পরিবেশে এবং পশ্চিম ধাঁচে কিন্তু মনটা ওর খাঁটি বাঙ্গালী এবং শিল্পীসুলভ। গান, ফুল কবিতাই যেন ওর জীবন। তাছাড়া বড্ড সেন্টিমেণ্টাল।

বিনয়বাবু সব বুঝেই বাংলাদেশের বাঙ্গালীর ঘরের শিক্ষিত ছেলে শান্তনুর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন সুলেখার।

স্বাস্থ্য চেহারা, ধন-ঐশ্বর্য, শিক্ষা ও বংশমর্যাদার কোনটিতেই

একবার তাকালেই বার বার ইচ্ছে করে তাকাতে। চোখে চোখ পড়লেই যেন সুলেখার সমস্ত শরীরে বিদ্যুতের বন্যা বয়ে যায়। বাধ্য হয়ে সুলেখা সেখান থেকে সরে অন্য কোথাও গিয়ে কি সব ছাই-পাশ চিন্তা করে রজতকে ঘিরে।

চুরি করে দেখতে গিয়েও ধরা পড়ে বারে বারে। রজত যেন বাতাসে ওর উপস্থিতির গন্ধ পায়।

রজত শান্তনুর চেয়ে বছর দুয়েকের জুনিয়র হলেও ওদের বন্ধুত্ব অনেক দিনের।

চাকরী জীবনে ঢুকে বেশ কয়েকবছর দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল নয়। বাবা মারা যাবার পর তিনটি বোনের দায়িত্ব শেষ করতে করতে বয়স তিরিশের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। বোনেরা অবশ্য প্রায়ই আব্দার করে বলে বিয়ের কথা। রজত রাজী হয় না। বলে—আর কেন, এই তো বেশ আছি। তোরা আর বিরক্ত করিসনে। বয়সের বাকী ক'টা দিন একটু নিরিবিলিতে থাকতে দে। কাগজ কলম নিয়ে সময়টা সুন্দর কাটছে। কে আবার কোত্থেকে অচেনা অজানা এসে হয়তো আমার সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাবে। হয়তো সুখী করতে পারবো না তাকে। তাছাড়া বিয়ের প্রয়োজনটাও আর সাড়া জাগায় না মনে।

রজত তাই কাজ করে আর সাহিত্য করে। কথা দিয়ে কথামালা রচনা করে। তাতেই ওর তৃপ্তি।

একটা জীবন্ত উপন্যাস কথা বলে চলেছে অপূর্ব এক ছন্দে। সুলেখা অবাক হয়ে শোনে রজতের কথা।

তাই রজতের মধ্যে ও অনুভব করে এক দুর্নিবার আকর্ষণ।

সম্বিত ফিরে পায় সুলেখা। শাড়ীর আঁচলটা ভাজ করে কাঁধের উপর ফেলে আর একবার ভালো করে দেখে নেয় কোথাও খুঁত রইলো কি না। চোখের কোণের সরু কাজল রেখাটা অমর একটু লম্বা করে টেনে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ওর ঠোঁটদুটো এমনিতেই লাল টকটকে। ···বিমানের কথা তোর মনে পড়ে সুলেখা? সেও তোকে বলতো। 'তুমি ঐ চোখে আর কোনো পুরুষের দিকে তাকিও না। মনে পড়ে? একদিন বিমানকে পাওয়ার জন্যে তুই কি করেছিলি?

প্রতিচ্ছবির প্রশ্নে সুলেখার স্মৃতির দুয়ার খুলে যায়। সুলেখা বলে, তা বলতে পারিস। বিয়ের পর থেকে বিমানের স্মৃতি আবছা হয়ে গিয়েছিল আমার মনে। অথবা বলতে পারিস শান্তনুর মধ্যেই বিমানকে মিশিয়ে দিয়ে নিজেকে ভরিয়ে নিতে চেয়েছিলাম।

অথচ বিমান চিরকুমার রয়ে গেল তোরই জন্যে। তোর চিন্তাতেই তোর মা সেই যে অসুখে পড়লেন আজও তিনি সেই শয্যাশায়ী। পরে তোর মায়ের কাছ থেকে বিমানের কথা জানতে পেরে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোর জন্য দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছেন তোর বাবা। সুলেখা চঞ্চল হয়ে বলে— তাই বলে আমার স্বামীর কাছে আমি অবিশ্বাসিনী নই।

যতটুকু সময় ওকে কাছে পেতাম ততটুকু সময়ও বাধ্য হয়ে শুনতে হতো ওর আর কারবারের হিসেব নিকেশের কথা। আমাকে মনোবেদনায় মুখ কালো করে থাকতে দেখলে ও ভাবতো আমার বুঝি কোনো জিনিসের অভাব হয়েছে। তখন একমুঠো টাকা গুজে দিতো আমার হাতে। টাকা ছাড়া আর কোন অনুভবই নেই ওর। ওর চেহারাটা যেমন পাথরের মত শক্ত, তেমনি ওর মনটাও একেবারে নিরেট। এতটুকু কমনীয়তা নেই তার কোথাও। আমি বার বার আমার মনটাকে খুলে ওর সামনে তুলে ধরে বলতে চেয়েছি—ওগো, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমার মনটাকে তৃপ্ত করো। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি ঈশ্বর ওকে অপার্থিব বস্তুটি থেকে বঞ্চিত রেখেছেন। এমনি করে একদিন সুলতা জন্মালো। আমার মনের হাহাকার কমলো না, বরং বাড়লো। কিন্তু আমি অসহায়। বাবা আমার মনের কথা বুঝতে পেরে মরবার আগে শেষে অনুরোধ করেছিলেন—সুলেখাকে তুমি নিজের কাছে নিয়ে রাখো। তাই বাবার মৃত্যুর পর ও গত পাঁচ বছর আগে আমাকে কাছে এনে রেখেছে। আমি প্রতিদিন মনের ফুলের মালা গেঁথে রাখি ওকে পরাবো বলে। কিন্তু রাত্রে ওর সামনে যেতেই আপনা আপনি সে মালা ঝড়ে যায়। আমি কত অসহায়। আমি হেরে গেলাম।

প্রতিচ্ছবি বলে—আর সেই জন্যেই রজতের উপরে তোর এত সমবেদনা। রজতকে তোর ভালো লাগে। রজতের উপন্যাসের কথাগুলো তোর মনে হয় যেন তোরই জন্যে লেখা। বার বার তাই রজতকে তোর দেখতে ইচ্ছে করে,

পম্‌রন

পম্‌রন। সবুজ নারিকেল বনে ঘেরা একটা দ্বীপের কিছুটা। রেললাইন সমুদ্রপথ পেরিয়ে এতদূর আসতে পেরেছে। সেজন্য সভ্যতার উঁকিঝুঁকি রীতিনীতিও এসেছে। ছুঁয়েছে এই দ্বীপের কোণে কোণে। মেয়েটি কিশোরী। এক ঝুঁটি করে চুল বাঁধা। রং কালো কিন্তু মুখখানা এত সুন্দর তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। চোখের মাতাল চাউনি যেন ঐ দ্বীপের দুরন্ত হাতছানিতে ভরা। চারিদিক নীল সমুদ্র ঘেরা। পম্‌রন ষ্টেশনটি ছোট হলেও জংশন। এখান থেকে সোজা গেলে রামেশ্বরম। অপরদিকে আর একটি রেলপথ চলে গেছে ধনুস্কটি। যারা তীর্থযাত্রী তারা সোজা যান রামেশ্বরমে। যারা যান সিলোন যায়—ধনুস্কটি। এখানে কেউ নামে না। নামে এখানের স্থানীয় লোকেরা। জায়গাটি ভারী সুন্দর। যেন এক নতুন দেশ নতুন দেশের অধিবাসী। অসভ্য নয়, আদিম নয়, আদিম নয়। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্য দেশের সব কিছুই এসেছে এখানে। তবু এরা যেন একটু আলাদা, কোথায় যেন কিসের একটু পার্থক্য আছে অন্য সকলের সঙ্গে।

রেষ্ট হাউসের সামনেই দাঁড়িয়েছিল কিশোরী মেয়েটি। বোধহয় কাজ করে দেয় যে এখানে থাকে তার। চৌকিদার এসে আমাদের বলল আপনারা যে কয়নিন থাকবেন, এই মেয়েটিকে রেখে দিতে পারেন। কাজ করে দেবে আপনাদের। যাবার সময় যা হয় কিছু দিয়ে দিবেন।

বিদেশ বিভুই জায়গা। কাউকে চিনিনা। একটা অচেনা মেয়ে কি জানি কেমন হবে। যদি চুরি করে সরে পড়ে। কিম্বা কোনো চোর ডাকাত দলের লোক হয়। ভিতরের খোঁজ খবর নেবার উদ্দেশ্যও এসে থাকতে পারে। হাসি বলল রেখে দাও, কি আর নেবে। একদিনের জন্যেই তো। বুলবুল-টাকে দেখতে পারবে। তবে কি জানি কি রকম। যার তার হাতে বাচ্চাকে ছাড়া যায় না। অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত রেখেই দেওয়া হলো। হাসি ওকে জিজ্ঞাসা করল, কি বলে ডাকব তোকে। নাম কি তোর।

মেয়েটি হেসে বলল, কুট্টি।

—বা বেশ নাম তো।

—কোথায় থাকিস।

—পম্বনে।

—তোর বাড়ীতে কে কে আছে।

—মা নেই?

—না।

অন্ধকার। পাশেই মন্দির রামেশ্বরমের। শিব আর পার্বতীর মন্দির। শিবের ডমরু আর শিঙা বাজানো শব্দই শোনা যাচ্ছে কখনো কখনো। জ্বর বেড়েছে হাসির। বুলবুলকে খাইয়ে ভুলিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে কুট্‌টি। তারপর না বলতে ও গিয়ে হাসি যেখানে শুয়ে আছে সেখানে মাথার কাছে বসেছে। আমি সামনের বিছানায় বসে। ঘরের আলোটা জ্বলছে নিঃশব্দে।

আবার ঐ ওষুধটা দিলাম। জ্বর ছাড়ার ওষুধ। এমনি করে মাদুরাই পৌঁছতে হবে। ভেঙে পড়লে চলবে না। ক্লান্ত ছিলাম খুবই ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল। ভাবছিলাম কি করি। জ্বরের ঘোরে হাসি শুয়ে আছে। কখনো ঘুমুচ্ছে কখনো জাগছে। ঐদিকে ঐ অচেনা কিশোরী মেয়েটিকে চিনিনি জানিনা। ঘুমলে যদি দরজা খুলে ও ওর দলের সবাই সব জিনিষ চুরি করে নিয়ে যায়।

অনেক ভেবে বললাম, এবার যা আর দরকার নেই। কুট্টি গেল না কিছুতেই। মায়েজীর শরীর খারাপ। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। আমি জেগে থাকব।

কি আর করি শোবার ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলাম পাশের ঘরটায় জ্বলুক। শুয়ে পড়লাম, ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত্রে যখনই ঘুম ভেংগেছে উঠেছি দেখেছি।

হাসির শিয়রে বসে জলপটি দিচ্ছে কুট্টি একভাবে জেগে জেগে।

শেষে ভোরের দিকে আবার জ্বর ছাড়ল ঘাম দিয়ে। কুট্টি গরম চা করে নিয়ে এসে দিলো আমাদের। বুলবুলকে দুধ গরম করে খাওয়ালো। সকালের গাড়ীতেই পালাবো। মেয়েটি বেশ ভাল। কাল সারারাত জেগে জেগে বেচারা সেবা করেছে আমার। কথটা বলেই হাসি বুলবুলের দিকে চেয়ে বলল—ওর আঙটিটা কোথায় গেল।

সর্বনাশ। যা ভেবেছিলাম তাই। কুট্টি কোথায় গেল। বাড়ীর বাইরে কোথাও সে নেই। নিখোঁজ হয়ে গেছে। চৌকিদারকে ডাকলাম বললাম। সে কিছু বলতে পারল না। বললাম সোনার আংটি হারাবার কথা। সে বলল, না বাবু কুট্টি সে রকম না। আমরা ওকে দেখছি রোজই।

কি করা যায়। মনে হলো চৌকিদারটাও মিলে রয়েছে। বিশ্বাস করার ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল।

রামেশ্বরম ষ্টেশনটি ছোট। নারিকেল গাছ ঘেরা। মনোরম। প্যাসেঞ্জার টেন। খালি গাড়ী। জায়গা অনেক পাওয়া গেল। গাড়ী ছাড়বার একটু আগেই দেখি কুট্টি। বলল, ও বাইরে কোথাও ছিল রেষ্ট হাউসে ফিরে আমাদের দেখতে না পেয়ে ছুটে এসেছে।

ধরলাম খপ্ করে ওর হাতখানা। বললাম, পুলিশে ধরিয়ে দেবো আংটি কোথায়।

হাসি কুট্‌টিকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে সে কি ওর কান্না। বললাম ওর বাবাকে। আমাদের ভুলের জন্যে ক্ষমা করো ভাই। তোমার মেয়ে খুব ভাল। আর আমাদের জন্য যা করেছে তার প্রতিদান নেই। টাকায় শোধ হয় না। এই নাও ওর কাজের টাকা আর বকশিস। ডাব কেটে আমাদের হাতে দিতে দিতে ওর বাবা বলল, বাবু ওর মা নেই। সে জন্য কোনো মায়েজীকে পেলে ও ছাড়তে চায় না।

ট্রেন ছেড়ে দিলো পম্বন স্টেশন। কুট্‌টি আর তার বাবা দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। কুট্‌টি চোখের জল মুছে হাসছিল আর আর হাত নাড়ছিল। কিন্তু আমাদের তখন চোখে জল ভরে গেছে। কি জানি কেন।

সমাপ্ত